সুন্দরবনের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি

ডক্টর প্রণব কুমার রায়

অনার্য
শূদ্রের বীণায় বাজুক রুদ্রের সুর

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	ভূমিকা	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস (ক)	২৭
		ভৌগোলিক বিবরণ (খ)	৫৪
তৃতীয় অধ্যায়	:	লোকজীবন ও সমাজ পরিচিতি	৬৪
চতুর্থ অধ্যায়	:	লোকঐতিহ্য	৯৮
		সংস্কার, বিশ্বাস, আচার; (ক)	১০০
		বস্তু উপাদান: লোকশিল্প, লোকস্থাপত্য; (খ)	১৪৪
		লোকসাহিত্য: লোকনাট্য, লোকসঙ্গীত (গ)	১৮৫
পঞ্চম অধ্যায়	:	শিল্পী সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট	২৭৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	উপসংহার	২৯২
		গ্রন্থপঞ্জি	৩৩৬
		চিত্রসমূহ	৩৪৭

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

কোন জাতিসত্তার পরিচয় সংস্কৃতির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। মানবজাতির চিন্তা-চেতনা, আত্মপ্রকাশ এবং ক্রমবিকাশের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক জড়িত। তাই মানুষের শিল্পজ্ঞান, সৃজনশীলতা, নৈতিকতা, বিশ্বাস ও আদর্শবোধ অর্জনে সংস্কৃতি বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানব জীবন-যাত্রার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশও সমান্তরাল ধারায় ঘটতে থাকে। তাই বিশেষজ্ঞের ভাষায় বলা যায়– 'Culture is a conscious striving toward progress and perfection'। সংস্কৃতি হ'ল প্রগতি ও পূর্ণতা অর্জনের একটি সচেতন কর্ম প্রয়াস।[১]

'সুন্দরবনের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি' শীর্ষক গবেষণা কর্মের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনাঞ্চলের সন্নিকটস্থ শ্যামনগর, আশাশুনি, কয়রা, পাইকগাছা, দাকোপ, মোংলা ও মোরেলগঞ্জ উপজেলার সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল পেশাজীবী সম্প্রদায় কিভাবে এতদঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর থেকে প্রকৃতির বিরূপ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে আছে এবং লোকজ ঐতিহ্যের ধারা বহন করে চলেছে তা গবেষণাকর্মে দেখানো হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এ অঞ্চলে বাস করলেও তারা যে কতটা উদার এবং অসাম্প্রদায়িক এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তারা যে অভিন্ন চেতনায় বিশ্বাসী তা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। গ্রন্থের নামকরণে 'সমাজ ও সংস্কৃতি' শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পেশাজীবী সম্প্রদায়ের (বাওয়ালী, মৌয়াল,

মৎস্যজীবী, মৌলঙ্গী, শিকারী, চুনারু) দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের দিকটি গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। সুন্দরবনের উত্তরভাগের প্রান্ত সীমা থেকে ৫-১০ কিলোমিটারের মধ্যে এসব পেশাজীবী সম্প্রদায় বসবাস করে।

সুন্দরবন মূলত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি। এক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ এক একটি গ্রাম বা একাধিক গ্রামরূপে চিহ্নিত হয়েছে। কালের পরিক্রমায় এভাবে গড়ে উঠেছে জনপদ। কিন্তু গ্রামের নামের সঙ্গে দেব-দেবী, নদ-নদী, খাল, মাছ, পাখি, জীব-জন্তুর নাম যুক্ত থাকে অর্থাৎ গ্রামের নামের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের অতীত সভ্যতার ইতিহাসের সূক্ষ্মধারার পরিচয় মেলে। শুধু তাই নয় এসব নামের মধ্যে ভূ-প্রকৃতির পরিচয় এবং অনার্য গোষ্ঠীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[২]

অরণ্যময় সুন্দরবনে নানা গাছের সমাহার। একদা যেসব অঞ্চলে যে গাছের আধিক্য ছিল সেই বন কেটে যে গ্রাম হয়েছে সে গ্রামের সাথে গাছের নাম যুক্ত হয়েছে। যেমন– কেওড়া সুন্দরবনের একটি সর্বপরিচিত গাছ। এই গাছের বন কেটে যে গ্রাম হয়েছে তার নামকরণ 'কেওড়াতলি'। অনুরূপভাবে ওড়া গাছের সাথে যুক্ত গ্রামের নাম 'ওড়াবুনিয়া'। একইভাবে আমতলা, গোলবুনিয়া, গরানবোস, লাউডোব, বেলতলি, সুন্দুরতলা ইত্যাদি। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনাঞ্চলেও একই ধারা লক্ষ করা যায়।

এমনিভাবে ঝোপ-জঙ্গলের শেষে যুক্ত কিছু গ্রামের নাম পাওয়া যায়। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এসব অঞ্চল ঝোপ-জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। যেমন– ঝাউবুনিয়া, ছিটাবুনিয়া, মরিচঝাঁপি ইত্যাদি। আর যে স্থান কাঁটাযুক্ত গাছে পরিপূর্ণ ছিল তার নাম হয়েছে কাঁটাখালি, বুজবুনিয়া ইত্যাদি। একইভাবে জীব-জন্তুর নামের সাথে যুক্ত অনেক গ্রামের নামের পরিচয় মেলে। যেমন– হরিণটানা, কুমিরমারী ইত্যাদি।

একইভাবে মাছের নামের সাথে যুক্ত গ্রামের নাম কাইনমারী, কৈখালি, টেংরাখালি, পুঁটিমারি আবার পাখির নামের সাথে যুক্ত গ্রাম হচ্ছে– কাকদ্বীপ, শকুনখালি ইত্যাদি। 'খালি' শব্দটি সুন্দরবনের বেশিরভাগ গ্রামের নামের

সাথে যুক্ত। খাল শব্দের অপভ্রংশ হচ্ছে খালি।[৩] বস্তুত সুন্দরবনে খাল-বিলই বেশি। আর গ্রামগুলি প্রধানত খালের পাশে গড়ে উঠেছে। তাই 'খালি' অন্তিক গ্রামের নাম অনেক রয়েছে। যেমন- ঝড়খালি, ভোজনখালি, সুতারখালি, পানখালি, নিশানখালি, ধামাখালি, পাতিখালি, জালিয়াখালি ইত্যাদি। দেব-দেবীর নামের সাথে যুক্ত কোন কোন গ্রামের নাম আছে। যেমন– কালীনগর, রামনগর, মহেশ্বরীপুর ইত্যাদি। এছাড়া কোন ইংরেজ শাসক বা জমিদারের উদ্যোগে বা পৃষ্ঠপোষকতায় যখন কোন এলাকা আবাদ হয় তখন সেই এলাকা তাদের নামে বা দেয়া নামে পরিচিতি লাভ করে। যেমন- মোরেল সাহেবের তত্ত্বাবধানে যে এলাকায় আবাদ হয় তার নাম 'মোরেলগঞ্জ'। এমনিভাবে হেঙ্কেল সাহেবের নামে হিঙ্গলগঞ্জ। কৃষ্ণনগরের মহেশগঞ্জের জমিদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী সুন্দরবনের যে এলাকা লীজ নিয়ে আবাদ করেন তিনি তাঁর মাতা কৈলাশীদেবীর নামে সে এলাকার নামকরণ করেন কৈলাশগঞ্জ। আবার সুন্দরবন আবাদকালে কোথাও 'খেজুর গাছ' দৃষ্ট হওয়ায় বা আবাদ পরবর্তীকালে খেজুর গাছ লাগানোর আধিক্যের কারণে সে গ্রামের নাম হয়েছে খেজুরিয়া। এমনিভাবে বটবুনিয়া, আমতলা, নলীয়ান (নল থেকে) নামগুলি এসেছে। এ গ্রামগুলি গাছের নামের সাথে যুক্ত। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, সুন্দরবন এবং তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষ বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেতে মা কালীর শরণাপন্ন হয়েছে বেশি। সেজন্য 'কালী' শব্দটির সাথে নানান জনপদ ও খাল বা নদী যুক্ত হয়েছে। যেমন– কালীখাল, কালীকাবাটী, কালীনগর, কালীগঞ্জ, কালেখার বেড়, কালীতলা ইত্যাদি। সুন্দরবন থেকে ১০০ মাইলের বেশি দূরত্বের অনেক স্থান 'কালী' নামটির সাথে বিশেষ পরিচিত।

সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রামের নামগুলি বিশ্লেষণ করলে অনেক ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, লোকসংস্কৃতি ও লোকাশ্রিত ধর্মের পরিচয় মেলে। বিশেষভাবে গ্রামের এ নামগুলি থেকে অতীত সুন্দরবনের ভৌগোলিক ও জনপদের পরিচিতি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। বস্তুত সুন্দরবনে নদীকে 'গাঙ' বলে। যেমন– ভদ্রা গাঙ, শিবসা গাঙ। এই গাঙ শব্দটি এসেছে গঙ্গা থেকে।[৪] 'গঙ্গা'